১৮৯১

নিজে নিজে পড়ে ক্যালকুলাস ও উচ্চতর গণিত শিখতে শুরু করেছে অ্যালবার্ট। হাতের কাছে বিজ্ঞানের বই পেলেই পড়ে ফেলছে। ম্যাক্স ট্যালমুড অ্যালবার্টের জন্য নিয়ে এলেন দুটো জনপ্রিয় পদার্থবিজ্ঞানের বই; লুডিগ বুশনারের (Ludwig Büchner) 'ফোর্স এন্ড মেটার (Force and Matter)' এবং আলেক্সান্ডার ভন হামবোল্টের (Alexander von Humboldt) 'দি কস্‌মসঃ এন অ্যাটেম্পট অ্যাট এ ডেসক্রিপশান অব দি ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড (The Cosmos: An Attempt at a Description of the Physical World)'। অ্যালবার্ট গোগ্রাসে পড়ে ফেললো বই দুটো। এরপর তার হাতে পড়লো অ্যারন বার্নস্টেইনের (Aaron Bernstein) পদার্থবিজ্ঞান সিরিজ; পদার্থ ও শক্তির বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মোট একুশ খন্ডের বই। অ্যালবার্ট পড়ে ফেললো জ্যোতির্বিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক শক্তি - অভিকর্ষজ শক্তির ওপর লেখা সবগুলো অধ্যায়।

অ্যালবার্টের মা পলিন চাচ্ছিলেন অ্যালবার্ট যেন সংগীতটা ভালো করে শেখে। পলিন নিজে তুখোড় পিয়ানোবাদক। মায়াকে শেখাচ্ছেন পিয়ানো। কিন্তু অ্যালবার্ট এখনো পর্যন্ত সংগীতকে সিরিয়াসলি নেয়নি। পলিনের প্রিয় হচ্ছে বেটোভেন। তিনি আশা করছেন অ্যালবার্ট একদিন তাঁর সাথে যুগলবন্দী করবে। তিনি পিয়ানো বাজাবেন, অ্যালবার্ট বেহালা। অ্যালবার্টকে উৎসাহ দিয়েই চলেছেন পলিন। এসময় হঠাৎ একদিন মোৎসার্ট ভালো লেগে গেলো অ্যালবার্টের। মোৎসার্টের সংগীতে কোথায় যেন গাণিতিক যুক্তির একটা ব্যাপার আছে। সেটা আবিষ্কার করতে গিয়ে সংগীতকে ভালোবেসে ফেললো অ্যালবার্ট।

১৮৯২

গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে অ্যালবার্টের গতির সাথে এখন আর তাল মেলাতে পারছেন না ম্যাক্স ট্যালমুড। তিনি চাইলেন অ্যালবার্টের জ্ঞানতৃষ্ণা অন্যদিকে প্রবাহিত করতে। অ্যালবার্টের হাতে তুলে দিলেন দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের জটিল বই 'দি ক্রিটিক অব পিওর রিজন (The Critique of Pure Reason)'। এই বইটি ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের পক্ষেও হজম করা কঠিন, অথচ

কিশোর অ্যালবার্ট গভীর আগ্রহ সহকারে পড়তে শুরু করেছে কান্টের দর্শন।

বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি প্রচন্ড আগ্রহ জন্মাবার পর, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেতে দেরি হলো না। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো

অ্যালবার্ট ও মায়া

অ্যালবার্টের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে। ধর্মীয় বইতে যা লেখা আছে, ধর্মের কাহিনী হিসেবে যে ঘটনাগুলোর বর্ণনা দেয়া আছে, সেগুলোর সাথে বিজ্ঞান ও দর্শনের যুক্তি মেলে না। শুধুমাত্র 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু'-তে বিশ্বাস রাখা সম্ভব নয়। গোঁড়া ইহুদি হবার ইচ্ছেটা মরে গেলো অ্যালবার্টের। আস্তে আস্তে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেললো সে। এখন সে বুঝতে পারছে কেন তার মা-বাবা ধর্মীয়

গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননা।

১৮৯৩

বারো বছর আগে উল্ম ছেড়ে মিউনিখে আসার পর থেকে ইলেক্ট্রিকের ব্যবসাটি মোটামুটি ভালোই চলেছে আইনস্টাইনদের। ১৮৯০ সাল থেকে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু হয়েছে। আর হারম্যান ও জ্যাকব বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে বেশ ভালোই উন্নতি করেছেন ব্যবসায়। এখন তাঁদের কারখানা আরো বড় হয়েছে। ফ্রাঙ্কফুর্টে হয়ে গেছে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বিরাট প্রদর্শনী। জার্মানির সম্রাট নিজে এসেছিলেন সেখানে। সেখান থেকে ফিরে জ্যাকবের মাথায় ঢুকেছে কারখানা আরো বড় করার পরিকল্পনা।

জ্যাকব একটি ডায়নামো উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর ইচ্ছা সেটি বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করে বাজারজাত করবেন। কারখানা আরো বড় করা হলো। প্রায় দু'শ কর্মী কাজ করছেন তাঁদের কারখানায়। কিন্তু আরো সব কারখানার সাথে প্রতিযোগিতা বাড়ছে দিনে দিনে। এসময় মিউনিখ সিটিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেবার টেন্ডার আহ্বান করা হলো। জ্যাকব ধরে রেখেছেন শহরের একমাত্র ডায়নামো প্রস্তুতকারক হিসেবে তাঁরাই পাবেন টেন্ডার। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো। আইনস্টাইনরা সরবরাহ করেন ডিসি কারেন্ট। কিন্তু অন্যান্য কোম্পানি দেখালো যে দূর থেকে সরবরাহ করার জন্য ডিসি কারেন্টের চেয়ে এসি কারেন্টের খরচ অনেক কম।

মিউনিখ শহরের বাইরে থেকেও অনেক কোম্পানি টেন্ডার দাখিল করছে। সেগুলোর মধ্যে আছে জার্মানির সবচেয়ে বড় কোম্পানি গুলো; এ-ই-জি (জার্মান এডিসন কোম্পানি), প্রথম ডায়নামো আবিষ্কারক ওয়ার্নার সিমেনের কোম্পানি সিমেন্স এন্ড কোম্পানি, এবং নুরেমবার্গের শুকার্ট (Schukert) কোম্পানি। এত বড় বড় কোম্পানির সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে ঘরবাড়ি সব বন্ধক রেখে ঋণ নেয়া হলো প্রচুর। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। টেন্ডার পেলো নুরেমবার্গের শুকার্ট কোম্পানি। আইনস্টাইনরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন।

মিউনিখে এখন কিছুই রইলো না তাঁদের। স্থির হলো ইটালিতে চলে যাবেন। সেখানে গিয়ে নতুন করে ব্যবসা করবেন। ইটালির মিলানে যাবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেলো। অ্যালবার্ট খবরটি শুনে তো ভীষণ খুশি। এখানকার স্কুল তার ভালো লাগছে না মোটেও। মিলানে চলে গেলে আর যাইহোক, অন্তঃত স্কুলের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

কিন্তু যখন শুনলো বাড়ির সবাই গেলেও তাকে থেকে যেতে হবে মিউনিখে,

ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেলো তার। আরো তিনবছর ধরে তাকে স্কুলের পড়া শেষ করতে হবে মিউনিখে থেকে, তাও আবার একা একা। তার মা-বাবা

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৮৯৩)

এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাধ্য হয়ে। কারণ জার্মানির নাগরিক হিসেবে ষোল বছর বয়সী ছেলেদের জন্য মিলিটারি সার্ভিস বাধ্যতামূলক। ইটালি গেলেও তাকে ফিরে আসতে হবে এই মিলিটারি সার্ভিস শেষ করার জন্য। তাছাড়া ইটালির স্কুলে তাকে ভর্তি করানো যাবে না। কারণ সে ইটালিয়ান ভাষা জানে না।

দূরসম্পর্কের এক মাসির বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হলো অ্যালবার্টের। মা পলিন খুব ভালোবাসেন অ্যালবার্টকে। কিন্তু সন্তানের ভালোর জন্য তিনি স্নেহ চেপে রাখতে জানেন। মায়ারও খুব কষ্ট হলো ভাইকে ছেড়ে যেতে। বছরের মাঝামাঝি অ্যালবার্টকে মিউনিখে রেখে মা বাবা বোন কাকা সবাই চলে গেলো ইটালির মিলানে।

মিউনিখে আইনস্টাইনের বাড়িটা বিক্রি করে দেয়া হলো। নতুন মালিক এসে একদিন মাটির সাথে মিশিয়ে দিলো তাদের পুরনো বাড়ি। অ্যালবার্ট দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করলো সবকিছু।

১৮৯৪

মিউনিখে মন খারাপ করে বসে আছে অ্যালবার্ট। মিলান থেকে মা ও বোনের চিঠি আসে। সেগুলো পড়ে মন আরো খারাপ হয়ে যায়। নতুন বাড়িটি কত সুন্দর, ইটালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মিউনিখের চেয়ে কত বেশি আকর্ষণীয় - চিঠিতে এসব পড়তে পড়তে মা, বাবা ও বোনকে বড় স্বার্থপর মনে হয় তার। কষ্ট ভুলে থাকার জন্য বইয়ের মধ্যে ডুবে যায় অ্যালবার্ট।

কান্টের দর্শন তাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছে। ইমানুয়েল কান্ট তাঁর 'হিস্ট্রি অব নেচার এন্ড থিওরি অব দি হেভেন্স (History of Nature and Theory of the Heavens)' বইতে আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ে সম্পর্কে যা লিখেছেন তা নিয়ে ভাবছে অ্যালবার্ট। আমাদের গ্যালাক্সির চাক্তিটি তারার সমুদ্রে একটি দ্বীপের মত। কান্ট 'ক্রিটিক অব পিওর রিজন (Critique of Pure Reason)' বইতে সময় সম্পর্কে লিখেছেন, 'সময় পরীক্ষালব্ধ কোন ধারণা নয়। সময় হলো আমাদের চিন্তাপ্রসূত একটি অনুভূতির ব্যাপার। স্থান ও সময়ের অনুভূতি সবার জন্য সমান নয়। এটি আপেক্ষিক।' কান্টের এই ধারণা গভীর রেখাপাত করে অ্যালবার্টের মনে। পরবর্তীতে এই ধারণা থেকেই আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

আরো তিন বছর মিউনিখের স্কুলে কাটাতে হবে ভাবতেই মন খারাপ হয়ে যায় অ্যালবার্টের। কী করা যায়? স্কুল পাস করার পর আবার তিন বছর মিলিটারি সার্ভিস করতে হবে! ভাবতেই কেমন যেন হয়ে যায় অ্যালবার্ট। জার্মানির সব ছেলেরাই মিলিটারি হতে চায়। কিন্তু আইনস্টাইন ব্যতিক্রম। মিলিটারিরা হুকুম করা ও হুকুম তামিল করা ছাড়া আর কোনকিছু করে না বা করতে পছন্দও করে না। আইনস্টাইনের কাছে মনে হয় মিলিটারিরা স্বাধীন মানুষ নয়। চিন্তার স্বাধীনতা না থাকলে আর মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার মানে কী?

স্কুলের নতুন শিক্ষাবছর শুরু হলো সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে। অ্যালবার্ট এবার জিমনেশিয়ামের সপ্তম বর্ষে যাচ্ছে। সপ্তম বর্ষ মানে দশম শ্রেণীর সমতুল্য। এরপর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী শেষ করার পরে ইউনিভার্সিটি পর্যায়ের পড়াশোনা শুরু করতে পারবে সে। কিন্তু তিন বছর এখানে সে থাকবে কী করে? ক্লাসে একজনও বন্ধু নেই তার। শিক্ষকরাও কেউ পছন্দ করেন না তাকে। সে যে ছাত্র হিসেবে খুব খারাপ তা কিন্তু নয়। স্কুলে গ্রেডিং করা হয় ১ থেকে ৪ পর্যন্ত। ১ হলো সবচেয়ে ভালো আর ৪ হলো সবচেয়ে খারাপ। আইনস্টাইন গণিতে বরাবর ১ পায়, ল্যাটিন ও গ্রিকে ১ বা ২ পায়। এবার অবশ্য গ্রিকে ৩ পেয়েছে। কারণ গ্রিক ভাষার শিক্ষককে সে ক্রমশ অপছন্দ করতে শুরু করেছে।

স্কুল শুরু হবার পর থেকে ভীষণ অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অ্যালবার্ট। নিজেকে খুব একা মনে হচ্ছে তার। মনে হচ্ছে তার মা-বাবা তাকে ত্যাগ করেছে। ডিসেম্বর এসে গেলো - অথচ মা-বাবার সাথে ক্রিস্টমাস কাটাবার কোন কথা বলছেন না তাঁরা। ক্রিস্টমাসের সময়টা একা একা কাটাতে হবে তাকে। ভাবতে ভাবতে অসুস্থ হয়ে পড়লো সে। চিকিৎসার জন্য গেলো ডাক্তার বার্নার্ড ট্যালমুডের কাছে। বার্নাড ট্যালমুড ম্যাক্স ট্যালমুডের বড়ভাই। ম্যাক্সের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিলো অ্যালবার্টের। সে হিসেবে ডাক্তার বার্নার্ডের কাছেও বেশ ভালো ব্যবহার পেলো অ্যালবার্ট।

হঠাৎ একটি বুদ্ধি এলো অ্যালবার্টের মাথায়। সে ডাক্তারকে অনুরোধ করলো একটি সার্টিফিকেট লিখে দিতে যে তাকে কয়েকমাস বিশ্রামে থাকতে হবে। বার্নার্ড বুঝলেন ব্যাপারটা। অ্যালবার্টের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা দেখে তিনি আসলেই মনে করছেন অ্যালবার্টের এখন মা-বাবার সাথেই থাকা উচিত কিছুদিন।

প্ল্যানের একটি অংশ কার্যকরী হলো। আরো লম্বা প্ল্যান আছে অ্যালবার্টের। তার ইচ্ছা আছে দর্শনের শিক্ষক হবে। কিন্তু ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি না থাকলে তা সম্ভব নয়। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে হলে স্কুল পাসের ডিপ্লোমা লাগবে। অ্যালবার্ট গণিতে দক্ষ। স্কুলের পড়ার বাইরে সে উচ্চতর ক্যালকুলাসও করে ফেলেছে এর মধ্যে। জিমনেশিয়ামের গণিত শিক্ষক জোসেফ ডাক্রুর (Joseph Ducrue) সাথে মোটামুটি ভালো সম্পর্ক আছে তার। অ্যালবার্ট ডাক্রুকে অনুরোধ করলো একটি সার্টিফিকেট লিখে দিতে। ডাক্রু লিখে দিলেন যে, স্কুল-ডিপ্লোমার জন্য যেটুকু গাণিতিক দক্ষতা দরকার, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের গাণিতিক দক্ষতা তার চেয়ে বেশি আছে।

স্কুল ছেড়ে চলে যাবার জন্য যা যা দরকার তা এখন অ্যালবার্টের হাতে। প্রিন্সিপালের কাছে ডাক্তারের সার্টিফিকেটটি নিয়ে গেলেই হলো। স্কুল ছাড়ার আগেরদিন গ্রিকভাষার ক্লাসে পেছনের বেঞ্চে বসে আছে অ্যালবার্ট। গ্রিক শিক্ষক অ্যালবার্টকে মোটেও পছন্দ করেন না, আর অ্যালবার্টও সহ্য করতে পারে না এই শিক্ষককে। স্যারের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে অ্যালবার্ট। স্যার মনে হচ্ছে সারাক্ষণই তার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছুটা ভয় ভয় লাগলেও খুব একটা পাত্তা দিলো না অ্যালবার্ট। কালতো সে চলেই যাচ্ছে, তবে আর ভয় কি! অ্যালবার্টকে কম যন্ত্রণা দেননি এই গ্রিক স্যার। অ্যালবার্টের বাবা একবার এসেছিলেন এই স্যারের কাছে অ্যালবার্টের ব্যাপারে কথা বলতে। সেদিন তো রীতিমত অপমানই করেছেন তিনি হারম্যান আইনস্টাইনকে,

— আপনার ছেলে তো একটা গাধা।

— আজ্ঞে স্যার, বলছিলাম কি - গাধাটা কী বিষয় নিয়ে পড়লে একটু ভালো করতো যদি পরামর্শ দিতেন - মানে কোন্ কাজের উপযুক্ত সে -

— কোন কাজেরই উপযুক্ত না সে। তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না জীবনে। শুধু শুধু পন্ডশ্রম করছেন।

কোন বাবাই নিজের ছেলে সম্পর্কে এরকম কথা শুনতে পছন্দ করেন না। কিন্তু অ্যালবার্টের বাবা হাসিমুখে সহ্য করে মাথা নিচু করে চলে গেছেন সেদিন। তার দ্বারা কিছুই হবে না জীবনে? ভাবতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় অ্যালবার্টের।

— মিস্টার আইনস্টাইন!

হঠাৎ চিৎকার করে ওঠেন গ্রিক স্যার।

— ইয়েস স্যার!

— ক্লাস শেষে আমার সাথে দেখা করবে।

— ইয়েস স্যার।

ক্লাসের সবাই চলে যাওয়ার পর গ্রিক স্যার দাঁত কিড়মিড় করে বললেন,

— তুমি আমার ক্লাসের একটি আবর্জনা।

— আমি তো কিছু করিনি স্যার।

— পেছনের বেঞ্চে বসে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিলে। এতে অন্য ছাত্রদের কাছে আমার সম্মান নষ্ট করেছো তুমি। আমার ক্লাসে বসে তুমি আমাকে অপমান করার সাহস দেখাও! এবার তুমি বিদেয় হও। স্কুলে পড়ে তোমার কিচ্ছু হবে না। তারচেয়ে স্কুল ছেড়ে দাও, আমার ক্লাসটা একটু শান্তি পাক।

স্যারের কথা শুনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হলো অ্যালবার্টের। স্যার নিজে থেকেই বলছেন স্কুল ছেড়ে দিতে - সে তো এমনিতেই চলে যাচ্ছে কাল। কিন্তু আবার মনে হলো তাকে স্কুল থেকে বহিস্কার করা হচ্ছে! এটা কি কিছুটা অপমানজনক নয়? সে যাই হোক। প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে বললো যে গ্রিক স্যার স্কুল ছেড়ে দিতে বলেছেন বলে সে স্কুল থেকে চলে যাচ্ছে।

ডিসেম্বরের ২৯ তারিখে স্কুল ছাড়লো আইনস্টাইন। জিনিসপত্র যা ছিলো তা আগেই গুছিয়ে রেখেছিলো। পরদিন বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একদৌড়ে মিউনিখ রেলস্টেশান। মিউনিখ থেকে মিলানের দূরত্ব প্রায় আড়াইশো মাইল। ট্রেনে চেপে বসলো অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

সুন্দর পাহাড়িপথ। এদিকে আগে কখনো আসেনি অ্যালবার্ট। কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে দেখলো দুপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু একটু পরেই মনের ভেতর খচখচ করতে লাগলো। কী বলবে সে মা-বাবাকে? তাঁরা তো কিছুই জানেন না এখনো। হঠাৎ তাকে দেখে অবাক তো হবেনই। কিন্তু কিছু একটা বলতে হবে তো। শুধু বলার জন্য নয়, এমনিতেই কী করবে সে এখন? ইচ্ছে আছে জুরিখের পলিটেকনিকে ভর্তি হবে। সেখানে ভর্তি হতে স্কুল পাসের সার্টিফিকেট দেখাতে হয়না, কেবল ভর্তি পরীক্ষায় পাস করলেই হলো। তাছাড়া গণিতস্যার তো তাকে

একটা প্রশংসাপত্র দিয়েই রেখেছেন। নিশ্চয় ভর্তি হতে পারবে সে। মিলান থেকে কত কাছে জুরিখের পলিটেকনিক, বর্ডারটা পার হলেই হলো। কিন্তু যদি জার্মানিতে ফিরে আসতে হয়? মিলিটারি সার্ভিসে ডাক পড়ে? না, কক্ষনো ফিরে আসবে না সে। জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগ করবে সে যেন আর কখনো জার্মানিতে ফিরে আসতে না হয়।

অ্যালবার্টকে দেখেই হৈ হৈ করে উঠলো মায়া। কিন্তু একটু পরেই শুরু হলো পলিনের জেরা। কেন সে পালিয়ে এসেছে? এত সাহস তার কী করে হলো। এবার কী হবে? এভাবে নিজের পায়ে কুড়োল মারে কেউ? ইত্যাদি বাক্য চলতে লাগলো। অ্যালবার্টের একটিই কথা - সে আর মিউনিখে ফিরে যাবে না। মা-বাবা দুজনই বুঝতে পারে - অ্যালবার্টকে আর বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। একটু ঠান্ডা হবার পর হারম্যান আইনস্টাইন কথা বললেন ছেলের সাথে।

— তা কী করবে ঠিক করেছো?

— আমি ফিলোসফির প্রফেসর হবো।

— কী! ওসব ফিলোসফিক্যাল ননসেন্স বাদ দাও। দর্শনের মাস্টারি করে পেটের ভাতও জোটাতে পারবে না। তারচেয়ে তোমার কাকার দিকে তাকিয়ে দেখো। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। কত সম্মান, কত টাকা।

— কিন্তু আমার ওসব ভালো লাগেনা।

— তা লাগবে কেন? ভালো জিনিস কেন ভালো লাগবে তোমার?

ঠান্ডা মাথার মানুষ বাবাকেও আজ রেগে যেতে দেখে অ্যালবার্ট বুঝতে পারে এখন তর্ক করার সময় নয়। বললো,

— ঠিক আছে, আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হবো।

বাবাকে সহজে বোঝানো গেলেও মাকে বোঝানো সহজ নয়। পলিন পলিটেকনিকে ভর্তির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শুরু করে দিয়েছেন।

১৮৯৫

মিলানে বড় আনন্দে কাটছে অ্যালবার্টের দিন। কয়েকমাস সে ঘুরে বেড়ালো এখানে সেখানে। পাহাড়ে উঠলো, হাঁটলো মাইলের পর মাইল। ইটালির গ্রামের দিকের সহজ সরল মানুষ দেখে বড় ভালো লাগলো তার। মনে হতে লাগলো, স্বাধীন মানুষের মত সুখি মানুষ আর হয়না। কিছুদিন পরেই মা মনে করিয়ে দিলেন পলিটেকনিক্যালে ভর্তিপরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার কথা। অ্যালবার্ট মনযোগ দিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের বই পড়তে লাগলো। গণিত আর পদার্থবিজ্ঞানের চর্চা চলছে নিয়মিত। কিন্তু পলিটেকনিক্যালের ভর্তি পরীক্ষায় শুধু গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান

থাকে না। সেখানে জীববিদ্যা, ভূগোল, ভাষাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়েও পাস করতে হবে। কিন্তু আইনস্টাইন সেগুলোর কিছুই জানেনা, সেসব বিষয়ে পড়াশোনাও করছে না।

ইতোমধ্যে আইনস্টাইনদের ব্যবসা আবার দেউলিয়া হয়ে গেলো। হারম্যান ছেলেকে বলে দিয়েছেন, আর খরচ দেয়া সম্ভব হবে না। কীভাবে পড়ার খরচ জুটবে তা নিয়ে আপাতত চিন্তা করছে না অ্যালবার্ট। ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির পাশাপাশি নিজস্ব গবেষণা নিয়েও ভাবছে সে।

ইথারের সাথে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের সম্পর্ক নিয়ে ভাবছে অ্যালবার্ট। জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল গাণিতিক ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ আছে। ১৮৮৮ সালে হেনরিখ হার্টজ পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে তড়িৎচুম্বক তরঙ্গ আছে এবং ইথারের মধ্য দিয়ে তা চলাচল করে। আইনস্টাইন ভাবছে ইথারের মধ্য দিয়ে যদি তা চলাচল করে তাহলে ইথারের সাথে তার সম্পর্ক নিশ্চয় আছে। কী সেই সম্পর্ক? ভাবতে ভাবতে আইনস্টাইন একটি গবেষণাপত্র তৈরি করে ফেললো। প্রবন্ধটিতে নতুন কোন আবিষ্কার ছিলো না, কিন্তু ষোল বছরের একজন কিশোরের পক্ষে এটাও অনেক। পাঁচ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধটি কাকে পড়ানো যায় ভাবতে ভাবতে পাঠিয়ে দিলো তার মামা সিজারের কাছে।

সিজার কোচ খাদ্যশষ্যের ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানের কিছুই জানেননা। কিন্তু দেখা গেলো তিনি তাঁর ভাগনের প্রবন্ধ হাতে নিয়ে উচ্ছসিত প্রশংসা করতে শুরু করেছেন। অ্যালবার্টের প্রশংসা করে তিনি বোন পলিনকে একটি চিঠি লিখলেন।

ভাইয়ের চিঠি পাবার পরেও পলিন কিন্তু খুব একটা উচ্ছাস দেখালেন না। তিনি চিঠি লিখলেন জুরিখের ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বা ফেডারেল পলিটেকনিক্যাল স্কুলে। তারা জানালো যে ভর্তির জন্য কমপক্ষে আঠারো বছর বয়স হতে হয়। কিন্তু অ্যালবার্ট যে মাত্র ষোল। এখন?

সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী নন পলিন। তিনি খোঁজখবর নিতে লাগলেন পরিচিত কেউ সাহায্য করতে পারেন কিনা। উল্‌মে থাকতে তাঁদের প্রতিবেশী ছিলেন গুস্তাভ মেইয়ার (Gustav Maier)। গুস্তাভ এখন জুরিখে থাকেন এবং জানা গেলো গুস্তাভের সাথে পলিটেকনিক্যালের ডিরেক্টর অ্যালবিন হারজগের (Albin Herzog) পরিচয় আছে। পলিন গুস্তাভ মেইয়ারকে অনুরোধ করলেন অ্যালবার্টকে ভর্তির ব্যাপারে তিনি যেন ডিরেক্টরকে বলেন। পলিন গুস্তাভকে জানালেন যে অ্যালবার্ট অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। বয়স কম হলেও তার বুদ্ধি ও মেধা বিস্ময়কর ভাবে বেশি। গুস্তাভ মেইয়ার আরো কিছু বাড়িয়ে বললেন পলিটেকনিক্যালের ডিরেক্টরের কাছে। জুরিখের পলিটেকনিক ইউরোপের সেরা প্রতিষ্ঠান। সেখানে ভর্তির সুযোগ পাবার জন্য অনেকেই অনেক রকম অনুরোধ করেন ডিরেক্টরকে। সুতরাং তিনি অ্যালবার্ট সম্পর্কে গুস্তাভের কোন কথাই বিশ্বাস

করলেন না। তবুও বললেন, যদি ভর্তি পরীক্ষায় পাস করতে পারে, তাহলে বয়স নিয়ে কোন সমস্যা হবে না।

ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে মায়ের সাথে জুরিখে এলো অ্যালবার্ট। এই প্রথম তার জুরিখে আসা। গুস্তাভ মেইয়ারের বাড়িতে উঠেছে তারা। জুরিখ শহরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলো অ্যালবার্ট। এবার ভর্তি পরীক্ষায় পাস করতে পারলে হয়। পরীক্ষা শুরু হলো অক্টোবরের আট তারিখ। কয়েকদিন ধরে চললো পরীক্ষা। পরীক্ষার দুটো অংশ। প্রথম অংশ হলো সাধারণ তথ্যাবলী - যাতে আছে ভাষার ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জার্মান ভাষা। দ্বিতীয় অংশ হলো বিজ্ঞান ও গাণিতিক দক্ষতা, যেখানে আছে বীজগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও কারিগরী অঙ্কন।

অক্টোবরের চৌদ্দ তারিখে ভর্তিপরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হলো। অ্যালবার্ট ও তার মাকে ডাকা হলো ডিরেক্টরের অফিসে। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে খুবই ভালো করেছে অ্যালবার্ট। পদার্থবিজ্ঞানে সে এতই ভালো করেছে যে, পলিটেকনিকের পদার্থবিজ্ঞানের প্রফেসর হেনরিখ ওয়েবার (Heinrich Weber) তাঁর ক্লাসে আমন্ত্রণ জানালেন অ্যালবার্টকে। শুধুই আমন্ত্রণ, কারণ সে সাধারণ তত্ত্বের অংশে পাস করতে পারেনি, ফলে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি অ্যালবার্ট। ডিরেক্টর হারজগ পরামর্শ দিলেন কাছের কোন শহরের স্কুল থেকে হাইস্কুলের পড়াটা শেষ করে পলিটেকনিকে ভর্তি হতে। গুস্তাভ মেইয়ার জুরিখের কাছে আরাউ (Aarau) স্কুলে আইনস্টাইনের ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। আরাউ স্কুলের শিক্ষক ইয়োস্ট উইন্টেলারের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হলো তার।

কিছুটা ভয় ও কিছুটা কৌতূহল নিয়ে আরাউয়ে এলো অ্যালবার্ট। আরাউ জার্মানির সীমান্তে সুইজারল্যান্ডের ছোট্ট একটি শহরতলী। স্কুলে জার্মান ভাষাতেই পড়াশোনা চলে। স্কুলের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন আগে। এখানেও কি তাকে পিছিয়ে পড়তে হবে? আর এটাও যদি মিউনিখের স্কুলের মত মিলিটারি কায়দার স্কুল হয়? আরাউ শহরটা দেখেই ভালো লেগে গেলো অ্যালবার্টের। সরু সরু রাস্তা, পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি ছবির মত গ্রাম।

স্কুলঘরটি পুরনো। তবে পাশেই নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। নির্মাণকাজ প্রায় শেষের পথে। স্কুলের ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্বের শিক্ষক ইয়োস্ট উইন্টেলারের (Jost Winteler) সাথে দেখা হলো অ্যালবার্টের। চমৎকার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব উইন্টেলারের। প্রথম আলাপেই ভালো লেগে গেলো অ্যালবার্টের। মনে হচ্ছে এখানে বেশ আনন্দেই কাটবে সময়।

আরাউ স্কুলে মোট তিনটি শ্রেণী। গ্রেড ওয়ান, টু আর থ্রি - মানে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী। দুরকম পদ্ধতিতে পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে।

জিমনেশিয়াম পদ্ধতি - যেখানে সুর করে মিলিটারি কায়দায় পড়াশোনা, আর লিবারেল স্কুল পদ্ধতি - যেখানে চিন্তার স্বাধীনতা আছে। উভয় পদ্ধতির ছেলেরা পলিটেকনিকে ভর্তি হতে পারে। আইনস্টাইন লিবারেল পদ্ধতিতে ভর্তি হলো। ভর্তি হবার আগে আরেকবার পরীক্ষা দিতে হলো। পরীক্ষার রেজালটের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হয় - কোন্ ক্লাসে ভর্তি হবে। আইনস্টাইন থার্ড গ্রেড মানে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পেলো। অর্থাৎ একবছর পরে এই ক্লাসটি পাস করলেই সে পলিটেকনিকে ভর্তি হতে পারবে।

উইন্টেলার পরিবারের সাথে থাকতে পেরে খুব ভালো লাগছে আইনস্টাইনের। ইয়োস্ট উইন্টেলারের স্ত্রী পলিন উইন্টেলার খুব সহজেই আপন করে নিলেন আইনস্টাইনকে। নিজের মায়ের নামের সাথে মিল দেখে আইনস্টাইন পলিন উইন্টেলারকে মা বলে ডাকতে আরম্ভ করলো। আর পলিনও আইনস্টাইনকে ছেলের মতই আদর করেন। উইন্টেলারদের সাতজন ছেলেমেয়ে, তিনজন মেয়ে ও চারজন ছেলে। বাড়িটিও অনেক বড়। আইনস্টাইনের জন্য আলাদা ঘর দেয়া হলো। এই পরিবারের সবার সাথে সহজেই ভাব হয়ে গেলো আইনস্টাইনের। একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো তার - তা হলো পারিবারিক গণতন্ত্র। যখনই সময় পায় ছেলেমেয়ে সবাই মিলে মাবাবার সাথে গল্প করে। যে কোন বিষয়ে যে কেউ নির্দ্বিধায় মত প্রকাশ করতে পারে।

এবাড়ির মেয়েরা সবাই গানবাজনার চর্চা করে। ছোট মেয়ে মেরির বয়স আঠারো, আইনস্টাইনের চেয়ে দুবছরের বড়। আইনস্টাইনকে তিনবোনই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে। মেরি খুব ভালো পিয়ানো বাজায়। আইনস্টাইন তার সাথে বেহালা বাজায়। এবং একসময় খেয়াল করে সে মেরির প্রেমে পড়ে গেছে। আইনস্টাইনের প্রথম প্রেম গোপন থাকেনা। কিছুদিন পরেই সবাই জেনে যায় তাদের প্রেমের কথা। উদার উইন্টেলার আঠারোত্তীর্ণ ছেলেমেয়েদের ইচ্ছায় বাধা দেননা। আইনস্টাইনের সময় যেন উড়ে চলে যায়।

১৮৯৬

জার্মানির বাধ্যতামূলক মিলিটারি সার্ভিস এড়াতে জার্মান নাগরিকত্ব ত্যাগ করার জন্য দরখাস্ত করেছিলো অ্যালবার্ট। জানুয়ারির ২৮ তারিখ থেকে অফিসিয়ালি সে আর জার্মানির নাগরিক নয়। পরবর্তী পাঁচ বছর কোন দেশেরই নাগরিকত্ব ছিলো না তার।

আরাউ আসার পরে বাড়ি যাওয়া হয়নি অনেকদিন। এপ্রিলের বসন্তকালীন

ছুটিতে বাড়িতে গেলো। মেরির কথা জানাজানি হয়ে গেছে। মায়া ও পলিন সমানে ক্ষ্যাপাচ্ছে আইনস্টাইনকে। পলিন মেরিকে না দেখেই পছন্দ করে ফেলেছেন। ভাবছেন অ্যালবার্টের সাথে মেরির বিয়ে হলে বেশ হয়। আইনস্টাইন প্রায় প্রতিদিনই চিঠি লেখে মেরিকে। ছুটি শেষ হবার আগেই আরাউতে ফিরে আসার জন্য ছটফট করছে সে।

বাড়ি থেকে ফিরে এসে দেখে স্কুলের নতুন বিল্ডিং তৈরি হয়ে গেছে। এপ্রিলের ২৬ তারিখে নতুন বিল্ডিং উদ্বোধন করা হলো। এর কয়েকদিন পরেই মে দিবস উদযাপন উপলক্ষে স্কুলে বিরাট অনুষ্ঠান হলো। আইনস্টাইনকে বলা হলো তলোয়ার যুদ্ধে অংশ নিতে। আইনস্টাইনের মাথার ভেতর এর মধ্যেই অহিংসার মন্ত্র ঢুকে গেছে। খেলাচ্ছলেও সে অস্ত্র হাতে নিতে রাজী নয়। কিন্তু তার কোন আপত্তি খাটলো না। বিকেলে আপাদমস্তক কালো পোশাক পরে, মানুষের খুলি আঁকা টুপি মাথায় দিয়ে হাতে টিনের তলোয়ার নিয়ে মাঠে উপস্থিত হলো আইনস্টাইন। এই প্রথম এবং এইই শেষ অস্ত্র হাতে নেয়া তার। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই প্রচন্ড বৃষ্টি নামলো, খেলা পন্ড হয়ে গেলো।

মে মাসের শেষে স্কুলের বসন্তকালীন পরীক্ষায় বেশ ভালো করেছে আইনস্টাইন। জিওলজিতে ভালো করার ফলে জিওলজির প্রফেসর মুলবার্গের সাথে ফিল্ডট্রিপে যাবার জন্য মনোনীত হয়েছে সে। সুইজারল্যান্ডের পূর্ব দিকে মাউন্ট স্যানটিসে ফিল্ড ট্রিপে রওয়ানা হলো মুলবার্গের গ্রুপ। মাউন্ট স্যানটিসের উচ্চতা ৮,১৪১ ফুট। জুন মাস, অনবরত বৃষ্টিতে পাহাড়ের পথ কর্দমাক্ত পিচ্ছিল। আইনস্টাইন হাইকিং বুট আনেনি। পিচ্ছিল পাহাড়ে ওঠার এক পর্যায়ে পা পিছলে পড়ে গেলো আইনস্টাইন। আর একটু গেলেই গভীর খাড়া খাদ। একজন সহপাঠী দ্রুত একটি লাঠি বাড়িয়ে ধরলো আইনস্টাইনের দিকে। লাঠি ধরে কোন রকমে খাদের মুখে থামলো আইনস্টাইন। আরেকটু হলেই খাদে পড়ে মৃত্যু হতে পারতো তার।

স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা ঘনিয়ে আসছে। আইনস্টাইন মনযোগ দিয়ে পড়ছে এখন। তার লক্ষ্য জুরিখের পলিটেকনিক। মেরির সাথে প্রেমের জোয়ারে কিছুটা ভাটা পড়েছে এখন। মেরিকে এখন আর তেমন ভালো লাগছে না তার। মেরিকে অবশ্য কিছু বলেনি সে। মেরি ভেবেছে সামনে পরীক্ষা বলেই তাকে সময় দিতে পারছে না অ্যালবার্ট।

মিলানের ব্যবসা মার খাওয়ার পর হারম্যান ও জ্যাকব মিলানের কাছে আরেকটি শহর প্যাভিয়াতে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। এবার সে ব্যবসাও মার খেয়েছে। জ্যাকব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর ব্যবসা করবেন না। তিনি চাকরি নিলেন একটি ইলেকট্রিক কোম্পানিতে। হারম্যান ভাবলেন মিলানেই আবার ব্যবসা শুরু করবেন। বাবার দুরবস্থা দেখে খারাপ লাগছে অ্যালবার্টের। কিন্তু সামনে পরীক্ষা,

এখন সে সবকিছু ভুলে পড়াশোনা করতে চায়।

সেপ্টেম্বরের ১৮, ১৯ ও ২১ তারিখে লিখিত পরীক্ষা শেষ হলো। লিখিত পরীক্ষায় সব বিষয়েই বেশ ভালো করলো আইনস্টাইন। কেবল ফরাসি ভাষায় খুব একটা ভালো করতে পারলো না। সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে মৌখিক পরীক্ষা হলো। মৌখিক পরীক্ষায় জুরিখ পলিটেকনিক থেকে দুজন প্রফেসর এসে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেন। এবার যে দুজন এসেছেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন পলিটেকনিকের ডিরেক্টর অ্যালবিন হারজগ, যিনি আইনস্টাইনকে স্কুলের পড়া শেষ করে আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আইনস্টাইন ছয়ের মধ্যে ৫.৩৩ পেয়ে দশজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথমস্থান অধিকার করলো।

স্কুলের পরীক্ষা পাস করে এবার জুরিখের পলিটেকনিক্যালে ভর্তি হতে কোন সমস্যা হলো না। কিন্তু সমস্যা হলো অন্যখানে। আইনস্টাইনের পড়াশোনা ও জুরিখে থাকা খাওয়ার খরচ আসবে কোত্থেকে? বাবার তো সামর্থ্য নেই। পলিন চিঠি লিখলেন তাঁর বৌদি জুলি কোচের কাছে। তারা খুব ধনী। কিন্তু আইনস্টাইন পছন্দ করে না তার এই জুলি মামীকে। জুলিকে তার অহংকারী বাচাল মনে হয়। কিন্তু জুলি মামী টাকা দিলে তা নিতে কোন আপত্তি নেই আইনস্টাইনের। জুলি পলিনকে লিখলেন যে, আইনস্টাইনের খরচ বাবদ তিনি প্রতি মাসে একশ সুইস ফ্রাংক পাঠাবেন। মাসে একশ সুইস ফ্রাংক - খুব একটা বেশি কিছু নয়, তবে কোনরকমে চালিয়ে নিতে পারবে আইনস্টাইন।

অক্টোবরের মাঝামাঝি জুরিখে এসে পৌঁছালো আইনস্টাইন। পলিটেকনিকে ভর্তি হয়ে প্রথমেই রেজিস্ট্রেশান করাতে হলো। হাজারখানেক নতুন ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। প্রায় সকলেই ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশান করাচ্ছে। আইনস্টাইন এখানে সব ছাত্রের চেয়ে বয়সে ছোট। ভর্তির ন্যূনতম বয়স আঠারো হতে এখনো ছয়মাস বাকী আইনস্টাইনের।

আইনস্টাইন রেজিস্ট্রেশান করালো "স্কুল ফর টিচার্স অব ম্যাথমেটিক্স এন্ড ফিজিক্স"- এ। পদার্থবিজ্ঞান তার মুখ্যবিষয়, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সহযোগী বিষয়। প্রথম সেমিস্টারে শুধু গণিত। পদার্থবিজ্ঞান শুরু হবে দ্বিতীয় সেমিস্টার থেকে। ক্যালকুলাস ও অ্যানালাইটিক্যাল জিওমেট্রি দিয়ে শুরু হলো আইনস্টাইনের পলিটেকনিকের পড়াশোনা। পলিটেকনিকের কাছেই একটি বোর্ডিং এ থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তার।

আইনস্টাইনের ক্লাসে সে সহ মোট ছাত্রছাত্রী পাঁচজন। তাদের মধ্যে তিনজনের মুখ্যবিষয় হলো গণিত। এই তিনজন হলো মার্সেল গ্রোসম্যান (Marcel Grossmann), জ্যাকব এহ্‌রাত (Jakob Ehrat) ও লুই কল্‌রোস (Louis Kollros)। আইনস্টাইন ছাড়া অন্য যেজন মুখ্য বিষয় হিসেবে পদার্থবিজ্ঞান নিয়েছে - সে একজন মেয়ে, মিলেইভা মেরিক। এই প্রথম কোন

মেয়েকে সহপাঠী হিসেবে ক্লাসে পেয়েছে আইনস্টাইন। আরাউর স্কুলেও সবাই ছিলো ছেলে। এখানে এই পলিটেকনিকেও আর কোন মেয়ে চোখে পড়েনি আইনস্টাইনের। তার কারণও আছে। ইউরোপে মেয়েদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার সুযোগ এখনো খুব সীমিত।

পাঁচজনের ক্লাসে পরস্পর বন্ধু হতে সময় লাগলো না কারো। মার্সেল গ্রোসম্যান ধনী বাপের ছেলে। কিন্তু সেজন্য একটুও অহংকার নেই তার। আইনস্টাইনের সাথে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেলো মার্সেলের। আইনস্টাইনের প্রতিভাকে উৎসাহ দিয়ে অনেকখানি উস্কে দিয়েছে গ্রোসম্যান। জ্যাকব এহ্‌রাত আইনস্টাইনের মতোই ইহুদি। পলিটেকনিকে হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র ইহুদি ছাত্র থাকলেও শুধুমাত্র ইহুদি হবার কারণে কাউকে কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি, বা ইহুদি হবার কারণে কাউকে বঞ্চিত করা হয়নি। লুই কল্‌রোস এসেছে ফ্রান্সের সীমান্তের একটি গ্রাম থেকে।

আর মিলেইভা এসেছে যুগোশ্লাভিয়া থেকে। আগে ওটা হাঙ্গেরির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। মিলেইভার বাবা মাইলোস অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। এখন সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা। দুইবোন এক ভাইয়ের মধ্যে মিলেইভা সবার বড়। জন্মথেকেই মিলেইভার একটি পায়ে সমস্যা আছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয় তাকে। তাছাড়া সার্বিয়ার মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক ভাবেই তার গায়ের চামড়া ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের মত সাদা নয়। সার্বিয়ানদের সুনজরে দেখে না ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ। জুরিখেও সার্বিয়ানদের নীচুজাত মনে করা হয়। মিলেইভা তাই যথাসম্ভব গুটিয়ে রাখে নিজেকে। সার্বিয়ার নভি সাদের একটি হাইস্কুল থেকে পাস করে এসেছে মিলেইভা। পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে খুব ভালো করেছে সে। স্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসে বসার জন্য মিলেইভাকে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়েছে। কারণ ইউরোপে মেয়েদের বিজ্ঞান পড়া এখনো অনেক স্কুলেই নিষেধ। ইউনিভার্সিটি অব জুরিখের মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলো মিলেইভা। কিন্তু ক্লাসে অন্যকোন মেয়ে না থাকায় ব্যবচ্ছেদ ক্লাসে সহপাঠী ছাত্ররা আজেবাজে মন্তব্য করে। সহ্য করতে না পেরে মেডিকেলের পড়া বাদ দিয়ে এখন এখানে ভর্তি হয়েছে পদার্থবিজ্ঞান পড়বে বলে। মিলেইভা আইনস্টাইনের চেয়ে বয়সে সাড়ে তিনবছর বড়। ক্লাসের অন্য তিনজন ছেলের চেয়েও বয়সে বড় সে।

পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি মিলেইভার আগ্রহ ও মেধা দেখে আস্তে আস্তে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে আইনস্টাইন। এদিকে আরাউয়ের মেরিকে এখনো আবেগপূর্ণ চিঠি লেখে সে। নিজের ময়লা জামাকাপড় মেরির কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর মেরি সানন্দে তা পরিষ্কার করে পাঠিয়ে দেয় আইনস্টাইনের কাছে।

এবছর ডিসেম্বর মাসের দশ তারিখে সুইডেনের বিখ্যাত আবিষ্কারক ও শিল্পপতি আলফ্রেড নোবেল (Alfred Nobel) মারা যান। নোবেলের উইল

অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় নোবেল পুরস্কার কমিটি। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ফিজিওলজি ও চিকিৎসা, সাহিত্য এবং শান্তি - এই পাঁচটি শাখায় ১৯০১ সাল থেকে প্রতি বছর পাঁচটি নোবেল পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

পূর্ব ইউরোপে ইহুদিদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক অত্যাচার বাড়তে শুরু করেছে। পশ্চিম ইউরোপে এন্টি-সেমিটিজম (anti-semitism) বা ইহুদিদের অধিকারের বিরুদ্ধে মতবাদ প্রবল হচ্ছে। এসবের প্রেক্ষিতে ইহুদিরা তাদের নিজেদের মাতৃভূমি জেরুজালেমে ফিরে যাবার জন্য সংগঠিত হতে শুরু করেছে। এ আন্দোলন জিয়োনিজম (zionism) নামে পরিচিত। পরবর্তীতে আইনস্টাইন জিয়োনিজম ও ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

১৮৯৭

পলিটেকনিকে পড়াশোনা চলছে আইনস্টাইনের। প্রথম সেমিস্টারে অনেকগুলো গাণিতিক বিষয় নিয়েছে সে। অ্যানালাইটিক জিওমেট্রি, জিওমেট্রি অব নাম্বারস, ডেস্ক্রিপ্টিভ জিওমেট্রি, প্রোজেক্টিভ জিওমেট্রি, থিওরি অব ফাংশান্স, পটেনশিয়েল থিওরি, ক্যালকুলাস অব ভ্যারিয়েশানস, ডিফারেনসিয়েল ইকোয়েশানস সহ আরো কয়েকটি গাণিতিক বিষয়।

কিছুদিনের মধ্যেই গণিতের প্রতি কিছুটা বিরক্ত হয়ে উঠলো আইনস্টাইন। যদিও বেশ কয়েকজন চমৎকার গণিত শিক্ষক আছেন পলিটেকনিকে। যেমন, হারম্যান মিনকৌস্কি (Hermann Minkowski), অ্যাডল্ফ হারউইজ (Adolf Hurwitz), কার্ল গেইজার (Carl Geiser), উইল্হেল্ম ফিডলার (Wilhelm Fiedler)। মিনকৌস্কি সুপ্রতিষ্ঠিত গবেষক। কিন্তু তিনি একেবারেই বাজেশিক্ষক। গণিতের কাল্পনিক কিছু তত্ত্ব তিনি ক্লাসে আউড়ে যান, যা কেউই বুঝতে পারে না। কোন বাস্তব উদাহরণ দেন না তিনি। ফলে তাঁর ক্লাস হয়ে পড়ে খুবই নিরস ক্লাস। আইনস্টাইন আস্তে আস্তে ক্লাস করা ছেড়ে দেয়। সে বুঝতে পারে, যে সমস্ত গণিত ক্লাসে শেখানো হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানের সাথে তাদের খুব একটা যোগসূত্র নেই।

দ্বিতীয় সেমিস্টারে পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাস শুরু হলো। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের নামে যা শুরু হলো তাকে পদার্থবিজ্ঞান বলে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে আইনস্টাইনের। ১৪০ জন ছাত্রের বিশাল ক্লাসে মেকানিক্স পড়ানো হচ্ছে। ডিরেক্টর অ্যালবিন হারজগ ইলাস্টিসিটি, ডায়নামিক্স এগুলো পড়াচ্ছেন। ক্লাসের বেশির ভাগই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। তাই পদার্থবিদ্যার কোর্সটিও ইঞ্জিনিয়ারদের

উপযোগী করেই তৈরি। কিন্তু আইনস্টাইন চাচ্ছে মৌলিক পদার্থবিজ্ঞান। কিছুটা আশাহত হয়েছে সে।

দ্বিতীয় সেমিস্টারের মাঝামাঝি সময়ে মিলেইভা জানালো, সে হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটিতে চলে যাচ্ছে। ভীষণ অবাক হলো আইনস্টাইন। মিলেইভার সাথে পরিচয় হবার পর থেকে গত প্রায় একবছর ধরে সে মিলেইভাকে নিয়ে ভেবেছে। প্রথম যে মেয়ের প্রেমে পড়েছিলো সে - মেরি উইন্টালের সাথে মিলেইভার তুলনা করে দেখেছে যে মেরির মধ্যে মিলেইভার কোন গুণই নেই। শুরুতে মেরিকে কিছু না জানালেও শেষের দিকে মেরির মাকে জানিয়ে দিয়েছে যে মেরির সাথে প্রেমের সম্পর্ক সে আর রাখতে চাচ্ছে না। মেরি একথা শোনার পর ভীষণ কষ্ট পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মেরি এমনিতেই খুব সরল সোজা মেয়ে। আইনস্টাইন যখন চিঠি লেখা বন্ধ করে দেয়, তখন সে এরকম কিছু না ভেবে ভেবেছিলো আইনস্টাইন সম্ভবত অসুস্থ। মেরি তখন আইনস্টাইনের মায়ের কাছে জানতে চেয়েছে আইনস্টাইনের খবর। উত্তরে পলিন তাকে বলেছেন, অ্যালবার্ট খুব অলস, তাই চিঠি লিখছে না।

আইনস্টাইন মিলেইভাকে এখনো জানায়নি তার ভালোবাসার কথা। মিলেইভাও নিশ্চয় ভেবেছে আইনস্টাইনের কথা। নইলে দুজন এত অন্তরঙ্গ বন্ধু হলো কীভাবে? কিন্তু এখন মিলেইভা চলে যাচ্ছে হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটিতে। কিন্তু কেন যাচ্ছে? হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটিতে মেয়েদের এখনো ডিগ্রি দেয়া হয়না। বিশেষ অনুমতি নিয়ে মেয়েরা ক্লাসে এসে লেকচার শুনতে পারে, কিন্তু সেজন্য কোন ক্রেডিট তারা পায়না। এসব জেনেও কেন যাচ্ছে মিলেইভা? আইনস্টাইন এ প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পায়না। মিলেইভা পরিষ্কার করে কিছুই বলে না তাকে। চলে যাবার আগে একদিন আইনস্টাইন ও মিলেইভা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ায়, পাহাড়ে, জুরিখের আশেপাশে। এর কয়েকদিন পরেই অক্টোবরের পাঁচ তারিখে পলিটেকনিক থেকে ভর্তি বাতিল করায় মিলেইভা এবং হাইডেলবার্গে চলে যায়।

মিলেইভা চলে যাবার পর হঠাৎ যেন সব খালি খালি মনে হচ্ছে আইনস্টাইনের। মনের আবেগ উজাড় করে দিয়ে চারপৃষ্ঠাব্যাপী একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলো মিলেইভাকে। সে জানে না মিলেইভার মনের অবস্থা কী। তাই মিলেইভাকে লিখেছে যেন লেখার প্রচন্ড ইচ্ছে না হলে চিঠি না লেখে। কিছুদিন পরে মিলেইভার চিঠি এলো। মনে হচ্ছে মিলেইভার মনে কিছুটা হলেও রেখাপাত করেছে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

১৮৯৮

এতদিন পরে পদার্থবিজ্ঞানের আসল কোর্স শুরু হয়েছে। পড়াচ্ছেন প্রফেসর হেনরিখ ওয়েবার (Heinrich Weber)। প্রফেসর ওয়েবার ইউরোপের বিখ্যাত গবেষক। শিক্ষক হিসেবেও তিনি অতুলনীয়। আইনস্টাইন মুগ্ধ হয়ে গেছে ওয়েবারের ক্লাস করে। ওয়েবার পড়াচ্ছেন তাপ ও তাপগতিবিদ্যা।

চৌষট্টি বছর বয়স্ক হেনরিখ ওয়েবার পলিটেকটিকে আছেন গত বিশবছর ধরে। ইয়েনা (Jena) ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট করার পর বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হারম্যান হেল্‌মহোলজের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন তিন বছর। ওয়েবার গবেষণা করেছেন অপ্‌টিক্‌স, হিট আর ইলেক্ট্রিসিটির ওপর। এ সংক্রান্ত বিষয়ে অনেকগুলো গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন তিনি। শেষের দিকে ইলেক্ট্রোটেকনোলজি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন ওয়েবার। কিন্তু ১৮৮৮ সালের পরে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেননি ওয়েবার। তখন তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন পলিটেকনিকে নতুন ফিজিক্স ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার কাজে। কয়েকবছরের মধ্যে নতুন ইনস্টিটিউটে ওয়েবার গড়ে তুলেছেন ইউরোপের সবচেয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার। হারম্যান হেল্‌মহোলজের সুপারিশে ওয়েবার ল্যাবোরেটরি সহকারী নিয়োগ করেছেন জিন পারনেটকে (Jean Pernet)। শুরু থেকেই জিন পারনেটের সাথে ওয়েবারের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। আইনস্টাইন যখন পলিটেকনিকে ভর্তি হয়েছেন তখন জিন পারনেট ও হেনরিখ ওয়েবারের মধ্যে কথাবার্তাও বন্ধ। আইনস্টাইন প্রফেসর ওয়েবারকে পছন্দ করেন বলে জিন পারনেট আইনস্টাইনকে অপছন্দ করতে শুরু করেছেন।

১৮৯৯

মিলেইভার সাথে নিয়মিত পত্রযোগাযোগ হচ্ছে আইনস্টাইনের। পলিটেকনিকের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে চিঠি লেখে আইনস্টাইন। মিলেইভাও জানায় হাইডেলবার্গের ঘটনা। পারস্পরিক ভালোবাসা এখন আর গোপন নেই কারো কাছে। আইনস্টাইন আদর করে মিলেইভার নাম রেখেছে ডলি (Dollie)। আর মিলেইভার কাছে আইনস্টাইন এখন জনি (Johnnie)।

ফেব্রুয়ারি মাসে মিলেইভা জানালো যে সে ফিরে আসছে জুরিখে। আইনস্টাইনের আর তর সইছে না। সে মিলেইভাকে তাগাদা দিচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসার জন্য। পলিটেকনিকে মিলেইভা কী কী কোর্স মিস করেছে তা

লিখে পাঠালো আইনস্টাইন। আইনস্টাইন মিলেইভাকে লিখলো,

ফিরে এসো যত দ্রুত সম্ভব, ফিরে এসো তোমার জনির কাছে। দেখবে এখানে তোমার কোন অসুবিধে হবে না। পলিটেকনিকে তুমি যা মিস করেছো তা খুব দ্রুতই পুষিয়ে নিতে পারবে তুমি। আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

বসন্তকালীন ছুটি এসে গেলো। আইনস্টাইন ছুটি কাটাতে চলে গেলো মিলানে নিজেদের বাড়িতে। ছুটি শেষে জুরিখে ফিরে দেখে মিলেইভা চলে এসেছে হাইডেলবার্গ থেকে। আইনস্টাইনের পৃথিবীটাই যেন বদলে গেলো মিলেইভাকে দেখে। হাইডেলবার্গে চলে যাবার সময় যে ছিলো কেবল সহপাঠী, এখন সে তার প্রেমিকা। আইনস্টাইন মহাউৎসাহে মিলেইভার পড়াশোনায় সাহায্য করতে লাগলো। কয়েকদিনের মধ্যেই তারা দুজন একসাথে বসে পড়াশোনা শুরু করলো। পড়াশোনার সুবাদে আইনস্টাইনের বেশির ভাগ সময় কাটে মিলেইভার বাসায়।

দেখতে দেখতে মিডটার্ম পরীক্ষা এসে গেলো। আইনস্টাইনের এবার নিজের কিছু পড়াশোনা করা দরকার। ক্লাসের পড়াশোনার প্রতি সে মনযোগ হারিয়ে ফেলেছে অনেকদিন। ঠিকমত ক্লাসও করে না। এখন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে দেখে ক্লাসনোটও কিছুই নেই তার। এদিকে মিলেইভা বুঝতে পারছে তার পক্ষে এখন চেষ্টা করেও পরীক্ষা দিয়ে পাস করা সম্ভব নয়। একটা বছর তার নষ্ট হবেই। আর এসময় সে আইনস্টাইনের কাছে থাকলে আইনস্টাইনেরও পড়া হবে না। মিলেইভা চলে গেলো তার মা-বাবার কাছে নভি সাদে।

আইনস্টাইন বন্ধু গ্রোসম্যানের কাছ থেকে ক্লাসনোট নিয়ে কোনরকমে পরীক্ষা দিলো। এই পরীক্ষাগুলোর পুরোটাই মৌখিক। অক্টোবরে বেশ কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা হলো। রেজালটের পরে দেখা গেলো চারজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে আইনস্টাইন ফার্স্ট হয়ে গেছে। ৬ এর মধ্যে সে পেয়েছে ৫.৭, আর গ্রোসম্যান পেয়েছে ৫.৬। আইনস্টাইনের একটু খারাপ লাগছে এই ভেবে যে ক্লাস না করে, গ্রোসম্যানের কাছ থেকে নোট নিয়ে গ্রোসম্যানকেই টপকে গেছে সে।

পরীক্ষা শেষে আইনস্টাইন আবার ফিরে গেলো নিজস্ব পড়াশোনার জগতে। বাসা বদল করে চলে এলো মিলেইভার বাসার কাছাকাছি একটি বাসায়। বাড়িওয়ালীর নাম ফ্রাউ মার্কওয়াল্ডার (Frau Markwalder)। বাড়িওয়ালীর মেয়ে সুজান মায়ের সাথে একই বাড়িতে থাকে। সুজান মার্কওয়াল্ডার একটি প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করে। নতুন বাসায় এসেই সুজানের সাথে পরিচয় হয়ে গেলো আইনস্টাইনের। সুজান হাসিখুশি মেয়ে, আর আইনস্টাইনও মেয়েদের সাথে হাসিতামাশা করতে ওস্তাদ। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেলো আইনস্টাইন ও সুজান একসাথে গানবাজনা করছে, সুজান পিয়ানো বাজিয়ে গাইছে, আর আইনস্টাইন বেহালা বাজাচ্ছে।

থার্ড ইয়ারে ওঠার আগপর্যন্ত কোনধরণের ল্যাবোরেটরি ওয়ার্ক করার সুযোগ

আসেনি আইনস্টাইনের। ওয়েবারের বিখ্যাত ল্যাবে কাজ করার জন্য সে অপেক্ষা করছিলো অনেকদিন থেকে। থার্ড ইয়ারে ওঠার পর দুটো ল্যাব সেশান আছে তার। একটি হলো প্রফেসর ওয়েবারের 'ইলেকট্রোটেকনিক্যাল ল্যাব', অন্যটি হলো প্রফেসর জিন পারনেটের 'ফিজিক্যাল এক্সারসাইজেজ ফর বিগিনারস'।

ওয়েবারের ল্যাবে দারুণ ভালো সময় কাটতে লাগলো আইনস্টাইনের। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তার গভীর আগ্রহ, কিন্তু পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানেও সে খুব আনন্দ পাচ্ছে। ওয়েবারের ল্যাবে আধুনিক সব যন্ত্রপাতি আছে, আর ওয়েবার নিজে ল্যাবের তত্ত্বাবধান করেন। আইনস্টাইন অনেক লেকচার ক্লাস বাদ দিয়ে ওয়েবারের ল্যাবোরেটরিতে সময় কাটাতে লাগলো।

প্রফেসর জিন পারনেটের ল্যাব কিন্তু মোটেও ভালো লাগছে না আইনস্টাইনের। বেঁটে মোটা গম্ভীর জিন পারনেটকে কোন ছাত্রই খুব একটা পছন্দ করতে পারেনা। আর আইনস্টাইন প্রথম থেকেই পারনেটের কাজের পদ্ধতির ওপর খুব বিরক্ত। আর পারনেটও আইনস্টাইনকে পছন্দ করতে পারছেন না। কারণ আইনস্টাইন তাঁর কোন কথা শোনে না। ল্যাবে ক্লাসের আগে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ কীভাবে করবে সে ব্যাপারে পারনেট একটি লিখিত নির্দেশনামা দেন সব ছাত্রকে। আইনস্টাইন কখনোই পারনেটের নির্দেশাবলী অনুসারে কাজ করে না। একদিন পারনেট দেখলেন আইনস্টাইন তাঁর নির্দেশাবলী লেখা কাগজটি দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে ডাস্টবিনে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো পারনেটের। ল্যাব সহকারীকে বললেন পারনেট,

— দেখলেন তো বেয়াদব ছেলেটার কান্ড! সে সবসময় আমি যা বলি তা না করে অন্য কিছু করবে।

— ইয়েস স্যার, তা ঠিক স্যার। তবে স্যার, অন্য পদ্ধতিতে করলেও সে কিন্তু ভুল করে না স্যার।

— ভুল হোক, আর শুদ্ধ হোক, আমি তার ইনস্ট্রাক্টর। আমি যা বলি তা সে শুনবে না কেন?

— ইয়েস স্যার, তা তো বটেই স্যার।

পারনেটের সহকারীটিও কিন্তু পারনেটকে পছন্দ করেন না। কিন্তু আইনস্টাইনের মত ঠোঁটকাটাও হতে পারেন না তিনি। কারণ তাঁর চাকরির প্রাণ রয়েছে পারনেটের হাতে।

পারনেট ডিরেক্টরের কাছে আইনস্টাইনের নামে রিপোর্ট করলেন। ল্যাবে কর্তব্যে অবহেলা করেছে আইনস্টাইন, বেয়াদবী করেছে ইত্যাদি অভিযোগ। আইনস্টাইন এসব শুনে ভীষণ রেগে গেলো। সে মুখোমুখি হলো জিন পারনেটের,

— আমি কোন্ কর্তব্যে অবহেলা করেছি স্যার?

— আইনস্টাইন, তুমি হলে একটা বেয়াদব। শুধু বেয়াদব না, উগ্র টাইপের

বেয়াদব। তোমার দ্বারা ফিজিক্সে কিছুই হবে না। তুমি ফিজিক্সের পেছনে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছো। তোমার ভালোর জন্যই বলছি, ফিজিক্স তুমি ছেড়ে দাও। ফিজিক্সের জটিল জটিল ব্যাপার তোমার মোটা মাথায় ঢুকছে না সেটা আমি বুঝতে পারছি। ফিজিক্স ছেড়ে তুমি মেডিকেল বা ল পড় গিয়ে। অন্তঃত পাস করতে পারবে।

আইনস্টাইন কী বলবে বুঝতে পারছে না। রক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে তার। অন্যায্য কথা সে সহ্য করতে পারেনা। আইনস্টাইনকে চুপ করে থাকতে দেখে পারনেট ভাবলেন আইনস্টাইন সম্ভবত মেনে নিয়েছে তাঁর কথা। বললেন,

— কী মেডিকেলে চলে যাবে? আমি সুপারিশ করে দিতে পারি। শুধু শুধু ফিজিক্সের অপমান তুমি কেন করবে? ফিজিক্স তোমার মত মাথামোটা ছেলেদের জন্য নয়। কি, সাবজেক্ট চেঞ্জ করবে?

— না স্যার, মেডিকেল বা ল পড়ার মত মেধা আমার নেই। আমি ফিজিক্সেই চেষ্টা করে দেখি - যদি পাস করতে পারি।

পারনেট নিজেকে খুব অপমানিত মনে করলেন। মনে মনে বললেন, পাস তোমাকে করাচ্ছি বেয়াদব ছেলে!

পরীক্ষার রেজালটে দেখা গেলো আইনস্টাইন প্রফেসর ওয়েবারের সবগুলো ল্যাব সেশানেই পেয়েছে ছয়ের মধ্যে ছয়, কিন্তু জিন পারনেটের ল্যাব সেশানে পেয়েছে ছয়ের মধ্যে এক। পারনেটের ক্লাসে আইনস্টাইনের চেয়ে কম আর কেউ পায়নি।

মিলেইভা এখনো নভি সাদ থেকে ফেরেনি। চিঠিতে যোগাযোগ হয় নিয়মিত। এদিকে বাড়িওয়ালীর মেয়ে সুজানের সাথে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে আইনস্টাইনের। সুজানকে নিয়ে বেড়াতে যায় এখানে সেখানে। আইনস্টাইন ব্যায়াম করতে পছন্দ করে না, কিন্তু হাঁটতে বা পাহাড়ে উঠতে ভালো লাগে তার। সুজানকে নিয়ে জুরিখের পাহাড়ি পথে অনেকগুলো বিকেল কাটিয়েছে সে। ঘরের কাছেই জুরিখ হ্রদ। হ্রদে ছোটছোট নৌকা চালায় অনেকে। একদিন নৌকা চালানো শুরু করলো আইনস্টাইন। একদিন চালিয়েই নেশা হয়ে গেলো তার। কয়েকদিন পর সুজানকে নিয়েই নৌকা ভাসায় জুরিখ হ্রদের জলে। যখন বাতাস কমে যায়, নৌকায় বসেই আইনস্টাইন কিছু গবেষণার কাজ করে ফেলে। একটা ছোট্ট নোটবুক তার সাথে থাকে সবসময়। সুজান দেখেছে অনেক সময় পিয়ানো বাজাতে বাজাতেও হঠাৎ বাজনা থামিয়ে নোটবুকে কিছু টুকে রাখছে আইনস্টাইন।

একদিন এমনিতে মজা করার জন্য পাইপ ধরায় আইনস্টাইন। কিন্তু ওই ধরানোটাই কাল হলো তার। পাইপ আর ছাড়তে পারেনি সে। পলিটেকনিকেলের আশেপাশের কফিশপে আইনস্টাইন আর গ্রোসম্যান ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করে ফিজিক্স ও অন্যান্য বিষয়ে। পাইপ টানে আর কফি খায়। কফি খেতে দারুণ

ভালোবাসে আইনস্টাইন। গ্যালন গ্যালন কফি খেতে পারে সে। কফি আর প্যাস্ট্রি দিয়েই পেট ভরায় সে।

গ্রোসম্যানের মেজর সাবজেক্ট গণিত, আর আইনস্টাইনের ফিজিক্স। ফিজিক্স আর ম্যাথম্যাটিক্স নিয়েও তর্ক হয় দুজনের মধ্যে। আইনস্টাইন মনে করে গণিত হলো জাস্ট একটি যন্ত্র - যেটা দিয়ে বিজ্ঞানের কলকব্জা খুলে পরীক্ষা করে আবার জোড়ালাগিয়ে দেয়া যায়। ফিজিক্সের জন্য গণিতের দরকার আছে। কিন্তু গণিত নিজে নিজে খুব একটা কাজের কিছু নয়। গ্রোসম্যান সহজে মেনে নেয়না আইনস্টাইনের কথা। সে ঠাট্টা করে বলে,

— আরে ফিজিক্স তো ম্যাথের চেয়ে দরকারী হবেই। এই দ্যাখোনা, ফিজিক্স পড়ার আগে আমি টয়লেটে যেতে ভয় পেতাম। টয়লেট থেকে একজন বেরিয়ে আসার পর টয়লেটে গিয়ে বসলে মনে হতো জীবাণু আক্রমণ করবে আমাকে। কিন্তু ফিজিক্স পড়ার পরে জানলাম, না জীবাণু নয়, টয়লেটের সিট গরম হয়ে যায় তো নিম্নাঙ্গের তাপ পরিবাহিতার কারণে। ফিজিক্স না পড়লে কি আমি কখনো জানতে পারতাম, টয়লেটের সিট কেন গরম হয়?

বসন্তকালীন ছুটিতে বাড়ি যাবার সময় আইনস্টাইন মিলেইভার একটি ছবি সাথে নিয়ে গেলো মাকে দেখানোর জন্য। পলিন অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'খুব চালাক মেয়ে'! আইনস্টাইন বুঝতে পারেনা এটা কি প্রশংসা, নাকি অন্যকিছু।

ফেডারেল পলিটেকনিকের শেষ বর্ষে এসে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লেন আইনস্টাইন। হতাশাটা এসেছে মূলত প্রফেসর ওয়েবারের গবেষণার হাল দেখে। ওয়েবারের ল্যাব দেখে খুশি হয়ে গিয়েছিলেন আইনস্টাইন। কিন্তু দেখলেন ওয়েবার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণার তেমন কোন খবরই রাখেন না। জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। অথচ ওয়েবার ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম সংক্রান্ত কোন গবেষণাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। মাত্র কয়েকবছর আগে হেনরিখ হার্জ ম্যাক্সওয়েলের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের পরীক্ষামূলক প্রমাণ করেছেন। সেসময় ওয়েবার ব্যস্ত ছিলেন তাঁর ল্যাব তৈরির কাজে। ফলে কোন খবর রাখতে পারেননি, এবং একবার পিছিয়ে পড়ার পর আর তাল রাখতে পারেননি আধুনিক গবেষণার সাথে। ওয়েবার তাঁর সিলেবাসের কোথাও ম্যাক্সওয়েল বা হার্জের কোন গবেষণাকে স্থান দেননি।

আইনস্টাইন ওয়েবারকে এগুলো বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে এসেছেন। আইনস্টাইন দেখছেন, ওয়েবারের ক্লাসে ফিজিক্সের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কেও তেমন কোন ধারণা তিনি দেননি। পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানে ভালো করতে হলে পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোতো জানতে হবে। ওয়েবার তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানকেও খুব একটা গুরুত্ব দেননি। ওয়েবার শুধু বৈজ্ঞানিক পরিমাপের খুঁটিনাটি ও

ইলেকট্রোটেকনোলজি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। আইনস্টাইন ক্রমেই আগ্রহ হারাচ্ছেন ওয়েবারের প্রতি। ওয়েবারের ক্লাসেও এখন নিয়মিত যান না। নিজে নিজে পড়ে বুঝতে চেষ্টা করছেন সমসাময়িক গবেষণাগুলো।

ওয়েবার ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন। আইনস্টাইনকে তিনি স্নেহ করেন। ভেবেছিলেন আইনস্টাইন তাঁর কথামত কাজ করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আইনস্টাইন স্বাধীনচেতা। এখন ওয়েবারের মনে হচ্ছে, জিন পারনেটের কথা খুব একটা মিথ্যা নয়। আইনস্টাইন ছেলেটা বেয়াদব। একদিন আইনস্টাইনের ওপর রেগে গিয়ে বললেন ওয়েবার,

— আইনস্টাইন, তুমি খুব ব্রিলিয়্যান্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার একটি মারাত্মক সমস্যা আছে। সেটা কী জানো? তোমাকে কেউ কিছু শেখাতে পারেনা। তুমি কারো কথা শোন না, নিজেকে বড় বেশি বুদ্ধিমান মনে করো তুমি।

আইনস্টাইন বুঝতে পারেন ওয়েবারের সাথে সুসম্পর্কের শেষ এখানেই। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা বিষয়ে কোন সাহায্য তিনি ওয়েবারের কাছে পাবেন না। কার কাছে যাবেন? ডিপার্টমেন্টে আছেন প্রফেসর মিনকৌস্কি। তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত অনেকগুলো কোর্স পড়ান মিনকৌস্কি। আইনস্টাইন সে কোর্সগুলোর যে কয়টা নেয়া যায় তার সবগুলো নিয়েছে। কিন্তু দেখা গেলো মিনকৌস্কিও তাঁর গাণিতিক পদ্ধতিগুলোর সাথে বাস্তব পদার্থবিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করছেন না। বাস্তব কোন উদাহরণ না দেখিয়েই মিনকৌস্কি তাঁর গাণিতিক পদ্ধতি বর্ণনা করে চলেছেন। আইনস্টাইন এখানেও হতাশ হয়ে নিজে নিজেই পড়তে শুরু করলেন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের সমসাময়িক গবেষণাগুলো। নিজে নিজেই তিনি পড়ছেন হারম্যান হেল্‌মহোলজ (Hermann Helmholz), আর্নস্ট ম্যাক (Ernst Mach), রুডল্‌ফ কার্শফ (Rudolf Kirchhoff), হেনরিখ হার্জ (Heinrich Hertz), জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James Clerk Maxwell) ও পল ড্রুডির (Paul Drude) বই।

আইনস্টাইন বন্ধু মাইকেল বেসোর দেয়া আর্নস্ট ম্যাকের বই 'দি সায়েন্স অব মেকানিক্স (The Science of Mechanics)' পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। এই বইতেই আইনস্টাইন প্রথম পড়লেন যে নিউটনের সূত্রগুলো দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায় না। আর স্থান ও সময় আলাদা আলাদা নাও হতে পারে। সময়ের সাথে স্থানের ধারণা বদলে যেতে পারে। কার্শফও নিউটনের সূত্রগুলোর সর্বাত্মক প্রয়োগের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আইনস্টাইনের চিন্তায় স্থান করে নিচ্ছে স্থান ও কালের পরিবর্তন সংক্রান্ত জটিল তত্ত্ব।

নিজে নিজে পদার্থবিজ্ঞান পড়তে গিয়ে ক্লাস একেবারেই করা হচ্ছে না আইনস্টাইনের। কিন্তু পাস তো করতে হবে। আইনস্টাইন ভাবেন, ডিগ্রিটা কোন রকমে নেবার পর পদার্থবিজ্ঞানের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আপাতত

পরীক্ষাপাসের একটা ব্যবস্থা করা যাক। বন্ধু গ্রোসম্যানের ক্লাসনোট তাঁর ভরসা। এদিকে মিলেইভাও প্রস্তুতি নিচ্ছেন থার্ড ইয়ারের মিড টার্মের। আইনস্টাইন বেশিরভাগ সময় মিলেইভার বাসাতেই কাটাচ্ছেন। দুজন একসাথে পড়তে বসেন। কিন্তু আইনস্টাইন বড় বেশি খাটান মিলেইভাকে। একটু পরপর আইনস্টাইনের জন্য কফি বানাতে হয় মিলেইভাকে। ভালোবাসার খাতিরে আইনস্টাইনের এ আবদার সহ্য করেন মিলেইভা।

গ্রীষ্মের ছুটি ছয় সপ্তাহ। আইনস্টাইন এবার ছুটি কাটাচ্ছেন জুরিখের কাছেই মেটমেনেস্টেটেনে (Mettmenstetten)। মিলান থেকে তাঁর মা ও বোন আসবেন সেখানে। আইনস্টাইন ট্রেনে চেপে চলে গেলেন মেটমেনেস্টেনে। মিলেইভা চলে গেছেন তাঁর মা-বাবার কাছে। অক্টোবরে তাঁর মিডটার্ম পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় পাস করতেই হবে তাঁকে।

হোটেল পেনশান প্যারাডাইসে উঠেছেন পলিন ও মায়া। আইনস্টাইন যোগ দিলেন সেখানে। সাথে অনেকগুলো বই নিয়ে গেছেন আইনস্টাইন। ছয় সপ্তাহে অনেক কিছু পড়ে ফেলার পরিকল্পনা আছে তাঁর। একটা রুটিন তৈরি করেছেন তিনি। সকালে হোটেলে বসে পড়াশোনা করবেন, বিকেলে ঘুরে বেড়াবেন আর সন্ধ্যায় বেহালা বাজাবেন। হোটেলের মালিক রবার্ট মার্কওয়েলারের (Robert Markwaller) সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আইনস্টাইনের। মার্কওয়েলের সাথে পাহাড়ে উঠলেন কয়েকদিন। আর কয়েকদিন বেরোলেন ছোটবোন মায়ার সাথে। এখান থেকে কাছেই মাউন্ট স্যান্টিস। আরাউয়ের স্কুলে পড়ার সময় এই পাহাড় থেকেই পড়তে পড়তে কোনরকমে প্রাণে বেঁচেছিলেন আইনস্টাইন। এবার মায়াকে নিয়ে আবার উঠলেন মাউন্ট স্যান্টিসে।

আগে মা আর বোনের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করার পরও কথা ফুরোত না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাদের সঙ্গে গল্প করতে আর আগের মত ভালো লাগছে না। মা আর বোনকে কেমন যেন বোরিং মনে হচ্ছে। মিলেইভাকে খুব মিস করছেন আইনস্টাইন। মিলেইভাকে হোটেলের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে চিঠি লেখেন আইস্টাইন। হোটেলের শান্ত নিরিবিলি পরিবেশও মাঝে মাঝে অসহ্য লাগছে আইনস্টাইনের। তাঁর মায়ের বেশ কিছু বন্ধু জুটেছে এই হোটেলে। এই মহিলারা দলবেঁধে রুমে আসেন। তাদের গল্পের বেশিরভাগ জুড়েই থাকে পরচর্চা। ভালো লাগে না আইনস্টাইনের। আরো মেজাজ খারাপ হয়ে যায় যখন মা তাঁকে অনুরোধ করেন বন্ধুদের বেহালা বাজিয়ে শোনাতে। প্রথম কয়েকদিন বেহালা বাজিয়ে শুনিয়েছেন, কিন্তু দুদিন পরেই বিরক্ত হয়ে গেছেন তিনি।

এই বিরক্তির মাঝেও সামান্য আনন্দের বাতাস গায়ে লাগে - যখন হোটেল মালিক রবার্ট মার্কওয়েলার তাঁর শ্যালিকা সপ্তাদশী অ্যানার সাথে আইনস্টাইনের পরিচয় করিয়ে দেন। সন্ধ্যেবেলা মায়ের বান্ধবীরা আসতে শুরু করলেই

আইনস্টাইন রুম থেকে বেরিয়ে চলে যান অ্যানা স্মিডের (Anna Schmid) ঘরে। অ্যানার সাথে খুনসুটি করতে বেশ ভালো লাগে আইনস্টাইনের। অ্যানা আইনস্টাইনের অটোগ্রাফ চাইলে আইনস্টাইন তার খাতায় লিখলেন,

ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে তুমি
কী লিখি তোমার খাতায়
মনে আসে অনেক কিছু
চুমু দিলে তোমার মুখে
রাগ করে কেঁদে ফেলোনা,
কঠিন শাস্তি সেটাই হবে
চুমুর বদলে চুমু দিলে।
এই লেখাটা মনে রেখো
স্মৃতি করে ধরে রেখো
দুষ্টু বন্ধু তোমার আমি
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

এতকিছুর মধ্যেও আইনস্টাইন হার্জের ইলেকট্রোডায়নামিক্সের বই পড়ছেন মনযোগ দিয়ে। হার্জের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ থিওরির সাথে ইথারের সম্পর্কের ব্যাপারে আইনস্টাইন একমত হতে পারছেন না। আইনস্টাইনের মনে ইথারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। তাঁর চিন্তাভাবনার অনেক কিছুই তিনি মিলেইভাকে লিখে জানান। মিলেইভা এখনো তাঁদের খামারবাড়িতে বসে পরীক্ষার পড়া তৈরি করছেন।

একদিন অন্যরকম একটি ব্যাপার ঘটলো। আইনস্টাইন আরাউ থেকে একটি চিঠি পেলেন হোটেলের ঠিকানায়। চিঠিটি লিখেছেন আরাউয়ের জুলিয়া নিগলি (Julia Niggli)। জুলিয়ার সাথে আইনস্টাইনের পরিচয় হয়েছিলো আরাউয়ের স্কুলে পড়ার সময়। জুলিয়া আইনস্টাইনের চেয়ে প্রায় ছয় বছরের বড়। আরাউয়ে থাকতে জুলিয়ার পিয়ানোর সাথেও বেশ কয়েকদিন বেহালা বাজিয়েছিলেন আইনস্টাইন। জুলিয়ার সাথে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিলো তাঁর। সে সময়ের বন্ধুত্বের সূত্রে জুলিয়া আইনস্টাইনকে চিঠি লিখেছেন। আইনস্টাইন আশ্চর্য হয়ে দেখছেন জুলিয়া চিঠিতে কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপারে আইনস্টাইনের পরামর্শ চেয়েছেন। জুলিয়ার সাথে একজন বয়স্ক লোকের প্রেম চলছে বেশ কিছুদিন থেকে। এখন লোকটি জুলিয়াকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন। বিয়ে করাটা উচিত হবে কিনা জানতে চেয়েছেন জুলিয়া। বিশ বছরের আইনস্টাইন পরামর্শ দিচ্ছেন ছাব্বিশ বছরের জুলিয়া নিগলিকে। আইনস্টাইন লিখলেন, কারো কাছ থেকে সুখের

প্রত্যাশা করা উচিত হবে না। এমন কি যাকে ভালোবাসে তার কাছ থেকেও নয়। যে মানুষটি আজ তাঁকে ভালোবাসে, কালই হয়তো সে বদলে যাবে। আজ যাঁকে খুব বিশ্বস্ত মনে হচ্ছে কালই হয়তো সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। আইনস্টাইন চিঠিটি লেখার সময় হয়তো মেরির সাথে তাঁর সম্পর্কের কথা ভেবেছিলেন। মেরির সাথে ধরতে গেলে তিনি তো বিশ্বাসঘাতকতাই করেছেন।

জুলিয়া আইনস্টাইনকে আরাউ যাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। আইনস্টাইনেরও খুব ইচ্ছে একবার জুলিয়ার সাথে দেখা করে আসেন। কিন্তু মাকে কীভাবে বলেন যে আরাউতে যাচ্ছেন জুলিয়ার সাথে দেখা করতে। আরাউর মেরির সাথে সম্পর্ক হবে ভেবে মা কত খুশি হয়েছিলেন। আর আইনস্টাইন সে সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছেন। মিলেইভাকে মা মেনে নিতে পারছেন না। এর ভেতর আবার জুলিয়া নিগলির কথা জানতে পারলে সাংঘাতিক কান্ড ঘটবে। তারচেয়ে অন্যকিছু ছুঁতো খুঁজে বের করতে হবে। উপায় একটি পেয়েও গেলেন। আইনস্টাইন জানতে পেরেছেন আরাউতে ইয়োস্ট উইন্টেলারের বাড়িতে এখন প্রফেসর হাব (Haab) এসেছেন ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট হিসেবে। প্রফেসর হাবের সাথে দেখা করতে যাবার কথা বললে মা কিছু মনে করবেন না।

কিন্তু আরাউ যাবার পথে আরেকটি ব্যাপারে কিছুটা টেনশান লাগছে আইনস্টাইনের। যদি আরাউতে গিয়ে মেরির সাথে দেখা হয়ে যায়! মেরি এখন আরাউ থেকে কিছুটা দূরে ওল্ডবার্গের একটি স্কুলে মাস্টারি করেন। আইনস্টাইন মেরির সাথে সম্পর্ক শেষ করে দেয়ার পর আর দেখা হয়নি তাঁদের। এখন যদি মেরির সাথে দেখা হয়ে যায়? কিছুটা টেনশান নিয়ে আরাউতে পৌঁছে জানতে পারলেন মেরি এখন আরাউতে নেই। খুশি হয়ে জুলিয়ার সাথে দেখা করলেন আইনস্টাইন। আইনস্টাইনের ইচ্ছে ছিলো জুলিয়ার পিয়ানোর সাথে কিছুক্ষণ বেহালা বাজাবেন। কিন্তু জুলিয়ার আপাতত সংগীতের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। তিনি ব্যস্ত তাঁর প্রেমের ব্যাপারে আইনস্টাইনের পরামর্শ নিতে। আইনস্টাইন জুলিয়াকে পরামর্শ দিলেন বিয়ে না করতে। জুলিয়া আইনস্টাইনের পরামর্শ শুনেছিলেন। তিনি সারাজীবন অবিবাহিত ছিলেন।

সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখে আইস্টাইন, পলিন ও মায়া ফিরে এলেন মিলানে। কয়েক সপ্তাহ পরেই মিলেইভার মিডটার্ম পরীক্ষা। মিলেইভা এখনো জুরিখে ফেরেননি। মায়া ঠিক করেছে আরাউতে টিসার্চ কলেজে পড়তে যাবে। থাকবে উইন্টেলারদের বাড়িতে। আইনস্টাইন মায়াকে পৌঁছে দেয়ার জন্য আরাউতে যাবেন। কিন্তু এবারেও খুব টেনশান হচ্ছে তাঁর। কীভাবে তিনি উইন্টেলারদের বাড়িতে যাবেন? মেরি যে এবারেও সেখানে থাকবে না তার নিশ্চয়তা কী! মায়াকে এসব বলাও যাচ্ছেনা। পরীক্ষার অজুহাতে আইনস্টাইন দিনে দিনেই ফিরে আসবেন বলে ঠিক করলেন। মেরি ছিলো না বাড়িতে।

আইনস্টাইন মায়াকে উইন্টেলারদের বাড়িতে রেখেই ফিরে এলেন মিলানে।

মিডটার্ম পরীক্ষায় খুব একটা ভালো করতে পারেননি মিলেইভা, কোনরকমে পাস করেছেন। এখন তিনি আইনস্টাইনের সাথেই ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষায় বসতে পারবেন।

জুরিখে ফিরে এসে আইনস্টাইন সুইজারল্যান্ডের নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত করলেন। এটার জন্য তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন গত কয়েকবছর থেকে। দরখাস্তের জন্য প্রতি মাসে পঁচিশ ফ্রাঁঙ্ক করে জমাচ্ছিলেন তিনি। অক্টোবর মাসে দরখাস্ত পাঠালেন। নভেম্বর মাসে জুরিখের পুলিশ এসে তদন্ত করে পুলিশ রিপোর্ট জমা দিলো।

আইনস্টাইন ও মিলেইভার এখন সবচেয়ে বড় চিন্তা হচ্ছে আইনস্টাইনের মা পলিন। তিনি কিছুতেই তাঁদের সম্পর্ক মেনে নিতে পারছেন না। ক্রিস্টমাস উপলক্ষে আইনস্টাইন বাড়িতে গেলে পলিন আইনস্টাইনকে শুনিয়ে শুনিয়ে মিলেইভা সম্পর্কে পরোক্ষভাবে অনেক আজেবাজে মন্তব্য করেছেন। আইনস্টাইন মায়ের সাথে এখনই এব্যাপারে মুখোমুখি হতে চাচ্ছেন না বলে কোনরকমে সহ্য করেছেন।